International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 428-434
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.237

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম

কৃষ্ণা মন্ডল
স্বাধীন গবেষক, কাকদ্বীপ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 20.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Yogendra Nath Mandal of Barisal was a prominent leader of the Namasudra community in undivided Bengal. Rising from a humble Namasudra family through arduous struggle, he ascended to the leadership of the community and played a pivotal role in the fight to establish the political rights of the Namasudras. Commencing his political journey with the Provincial Assembly elections of 1937, he continued as a legislator to wage a lifelong battle for the development and political rights of the Scheduled Castes. This article sheds light on his remarkable life and struggles, presented in the context of historical facts.

Keywords: Jogendra Nath Mandal, Namasudra Community, Scheduled Castes, Bengal Politics, Dalit Leadership

অবিভক্ত বাংলায় নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতিগোষ্ঠী। এদের তিন-চতুর্থাংশ বসবাস করতেন বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোহর ও খুলনা জেলায়। এই সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন বরিশালের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তিনি দরিদ্র নমঃশূদ্র পরিবার থেকে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে উন্নীত হয়েছিলেন এবং নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ অবধি দশটি বছর তিনি ছিলেন বাংলা তথা ভারতের নমঃশূদ্রদের অবিসংবাদী নেতা।[১] ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভা গঠন এবং 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' মেনে মুসলমান, শিখ, তপশিলি, ইউরোপীয়ান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রমুখদের জন্য আসন সংরক্ষিত রেখে ১৯৩৭ সালে প্রায় সার্বজনীন ভোটাধিকার নিয়ে যে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচন থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগেন্দ্রনাথের প্রবেশ। এই নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তপশিলি সংরক্ষিত নয় সাধারণ আসনে। নমঃশূদ্র, বাগরি, ধনন্তরী, কৈবর্ত, জোলা, ধোপা, মালো, দুলে, যুগি ও মুসলমানদের এবং সমর্থনকারী উচ্চবর্ণের একাংশের ভোটে যোগেন্দ্রনাথ বিপক্ষের দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রার্থী বাটাজোড়ের জমিদার, অশ্বিনী দত্তের ভাইপো এবং কংগ্রেস জেলাসভাপতি সরল কুমার দত্তকে পরাজিত করেন। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল দত্তমশাই পেয়েছেন ১০,৬৫৩টি ভোট আর যোগেন্দ্রনাথের ঝুলিতে ১২,০৬৯ টি ভোট। এমন তাবড় নেতাকে হারাতে পারা কম কথা নয়। সেটা সম্ভব হয়েছিল যোগেনবাবুর স্পষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের ফলে। নমঃশূদ্র যোগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মঞ্চ হিসাবে রাজনীতিকে বেছে নিয়েছিলেন। সকলের সমর্থন নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা ছিল না। জাতের দোহাই দিয়ে

সমাজের একাংশের মানুষকে যুগে যুগে অত্যাচার ও অবমাননা করা, শিক্ষা, চাকরি ও অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা, দৈনন্দিন জীবনে দূরে সরিয়ে রাখার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর রাজনীতি। আর সেই রাজনীতিতে আস্থা ছিল সে অঞ্চলের 'ছোট' জাতের সকলেরই। কৈবর্ত্য, জেলে-কৈবর্ত্য, জোলা, মুচি, রবিদাস- সকল 'নীচু' জাতের মানুষের সমর্থনে কংগ্রেস প্রার্থীকে হারাতে পেরেছিলেন নমঃশুদ্র যোগেন্দ্রনাথ।সারা ভারতে তিনিই একমাত্র তপশিলি প্রার্থী যিনি সাধারণ আসনে জিতে বাংলার প্রাদেশিক আইনসভায় গেলেন স্বতন্ত্র তপশিলি হিসাবে। ১৯৩৭ সালে বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচনে ৩২ জন তপশিলি প্রার্থী বিধায়ক হন এবং তার মধ্যে ১৩ জন ছিলেন নমঃশূদ্র। তাঁরা মিলে তৈরি করলেন 'বেঙ্গল অ্যাসেমব্লিজ ইনডিপেনডেন্ট শিডিউল কাস্ট মেম্বার্স লিগ' যার সভাপতি হলেন হেমচন্দ্র নস্কর ও সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল।[২]

১৯৩৭-র নির্বাচনের পরপরই বাংলার দাপুটে নেতা এবং সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের 'কৃষক প্রজাপার্টি' জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও কৃষকদের ঋণ মকুবের মত জনপ্রিয় দাবিতে একচ্ছত্র মুসলমান ভোট পেয়ে মুসলিম লিগকে হারিয়ে দেয়। ফজলুল হক যোগেন্দ্রনাথকে আহ্বান জানান তপশিলি ব্লক করে প্রজাপার্টির সরকারকে সমর্থন করতে। হক সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেও যোগেন্দ্রনাথ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাদের অনীতিনিষ্ট ও ক্রমপরিবর্তনশীল অবস্থান সমর্থন করেননি এবং প্রস্তাব পেয়েও মন্ত্রীত্বে যোগ দেননি। বিধানসভায় যোগেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বক্তব্য ও আইনি যুক্তি দিয়ে তপশিলিদের স্বার্থে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জমিদারি কাছারিতে তপশিলি প্রজাদের প্রতি অস্পৃশ্যতামূলক আচরণ রোধে তাঁর উত্থাপিত প্রস্তাব কংগ্রেস বিধায়ক মীরা দত্তগুপ্ত সমর্থন করেন। বিধানসভার সেশন শেষ হওয়ার পর যোগেন্দ্রনাথ বরিশাল ফিরে জেলাপ্রশাসন ও জেলার নেতৃস্থানীয় দের নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সমস্ত সরকারি ব্যবস্থায় তপশিলি সংরক্ষণ চালু করা, অগৈলঝরা স্কুলকে মডেল স্কুল গড়া সহ নমঃশূদ্র এলাকায় আরও স্কুল—কলেজ স্থাপন, মাইলারার পশ্চিমে খাল কেটে জল বের করে চাষের জমি বের করা। যোগেন্দ্রনাথ সহযোগীদের নিয়ে তাঁদের গৌরনদী সংলগ্ন স্বজাতি অধ্যুষিত ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ, পদ্মবিল, মতুয়া পীঠস্থান ওরাকান্দি প্রভৃতি পরিভ্রমণ করেন। ব্রিটিশ শাসনে তপশিলিদের সংরক্ষণকে কাজে লাগিয়ে দরিদ্র, অশিক্ষিত, পশ্চাদপর স্বজাতির উন্নয়নের ব্রত নেন।[৩]

স্বতন্ত্র তফসিলি এমএলএ হিসাবে এবং বিধানসভায় তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকার জন্য যোগেন্দ্রনাথ নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, আবুল হাসেম, হেমন্ত সরকার, বেগম শাকিনা মৌজিদদাজা, হেমন্ত বসু, ড. মেঘনাদ সাহা, ডাঃ রহমান বহু বিশিষ্ট রাজনীতিকদের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রায় সবদলের মন্ত্রী ও বিধায়কদের সাথে যোগেন্দ্রনাথের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এইভাবেই তিনি বাংলা তথা ভারতের বিশিষ্ট রাজনীতিক শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুর অত্যন্ত ঘনিষ্ট হয়ে ওঠেন । ১৯৩৮-৪১ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে সুভাষের কংগ্রেস সভাপতি হওয়া, গান্ধীগোষ্ঠী কর্তৃক কোণঠাসা হয়ে পদত্যাগ, বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসে আকচাআকচি থেকে মহানিষ্ক্রমণ অবধি নিজে কংগ্রেসে যোগ না দিয়েও যোগেন্দ্রনাথ সুভাষের রাজনৈতিক সচিবের কাজ করে গেছেন। সুভাষের নির্দ্দেশে তিনি অ্যালবার্ট হলে তফশিলিদের বড় সভার আয়োজন করেন, বড়তলা থেকে প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হন। এই সময় ৩৯ এ শরৎ বোসের বাড়িতে এ আই সি সি সম্মেলনে গান্ধী সহ কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্বের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। গান্ধীর সাথে তফশিলি মন্ত্রী-বিধায়কদের আলোচনায় হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশের মাধ্যমে এবং সকলকে কংগ্রেসে যোগদানের মাধ্যমে জাতিভেদ সমস্যার অবসানের গান্ধীর তত্ত্ব যোগেন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ

করে। এর মধ্যে বিধানসভায় যোগেন্দ্রের দাবীতে তপশিলিদের প্রতিবছর বিদেশ যাওয়ার বৃত্তি, ১৯ জনের ডাক্তারি পড়ার বৃত্তি, অন্যান্য বৃত্তি, ফাণ্ড, চাকরিতে সংরক্ষণ চালু হয়েছে। কিন্তু উচ্চবর্ণের নেতা আমলা আধিকারিকরা নানা কায়দায় এগুলি আটকে দিতে থাকে।

১৯৪০ পর্যন্ত ও ১৯৪৫-র পর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছিল বাংলার নিজস্ব রাজনীতি। এই নতুন সময়ে বাংলার তপশিলি নেতা বরিশালের যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ছিলেন অবিসংবাদী শূদ্র নেতা। ইতিমধ্যে যশোরের বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গার পর রসিকলাল বিশ্বাস তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তারপর যশোরের ঝিকরগাছা, মাগুরা, ছিরিপুর, কুইলা, নরাইল, শালিখা, লোহারতালা, লাউজানি, পানিসারা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘুরে রসিকলাল বিশ্বাস ও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল দেখলেন বাইরে থেকে হিন্দু মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রভৃতির স্বেচ্ছাসেবকরা এসে গুজব ছড়িয়ে ও কলকাতার কাগজে সেগুলি পল্লবিত করে মুসলমান-নমঃশূদ্র দাঙ্গা বাঁধাচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেস এক পক্ষ, লিগ অন্য পক্ষ। ব্রিটিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয়। তারা অনেক চেষ্টায় দাঙ্গা বন্ধ করলেন। মিশন ও সঙ্ঘের ক্যাম্পগুলি হটিয়ে দিলেন। যোগেন উপলব্ধি করেন, মুসলমানের রক্তে হাত রাঙিয়ে বর্ণহিন্দুদের দাঙ্গা থেকে রক্ষা করা কিংবা বর্ণহিন্দুর হয়ে লাঠি-সড়কি-বল্লম-কুড়ুল— নিয়ে মুসলিম মহল্লায় চড়াও হয়ে অগ্নিসংযোগ, গৃহদাহ, লুঠতরাজ ও হত্যালীলা চালানো কখনও, কিছুতেই বর্ণহিন্দুর অস্পৃশ্য নমঃশূদ্রদের দায় হতে পারে না। তাঁর কথায় আমি শিডিউলও না, হরিজনও না। বামুন যদি জন্ম পরিচয়ে বামুন হয়, আমি তা হলে আমার জন্ম পরিচয়ে চাঁড়াল। চাঁড়াল হিন্দু নয়। হিন্দুকে রক্ষা করাও তার দায়িত্ব নয়।[৪] বরং বরিশাল, ঢাকা, যশোর, খুলনা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহে গরিব মুসলমানের সঙ্গে সহাবস্থানের অভিজ্ঞতায় নমঃশূদ্ররা দেখেছেন, বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে তাঁদের যতটা সামাজিক দূরত্ব, মুসলমানের সাথে ততটাই নৈকট্য। আর এখান থেকে যোগেনের মুসলিম-দলিত ঐক্যের ভাবনা ও তার নিজস্ব তত্ত্ব বিশ্বে সেই ধারণার উত্তরণ।

সেই সময় বন্দীমুক্তি আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, মুসলিম লিগের আন্দোলন, গ্রামে ভাগচাষীদের আন্দোলন নিয়ে কলকাতা ও রাজ্য সরগরম। অনাস্থা, খেয়োখেয়ি, ষড়যন্ত্র নিয়ে মন্ত্রীসভা টালমাটাল। হক সাহেব যোগেন্দ্রনাথকে মন্ত্রী হবার প্রস্তাব দিলেন। যোগেন্দ্রনাথ ঐ টালমাটাল অবস্থায় সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। সেই সময় যোগেন্দ্রনাথ তপশিলিদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইতিমধ্যে অন্যদের নিয়ে যোগেন্দ্রনাথ 'অল বেঙ্গল শিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন' গড়ে তোলেন। পাশাপাশি সুভাষ বসুর সাথে কাজ করছেন। বরিশালে ব্যাপক সাইক্লোনে ভোলা প্রভৃতি অঞ্চল ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেই ভয়ঙ্কর দুর্যোগ, দুস্তর স্রোত আর উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ তেতুঁলিয়া, দৌলতখান, গয়াভাংগানি, লতা নদীর সীমানায় নৌকা করে ভাসান চরে পৌঁছান। সেখান থেকে দুদু মিঞাকে সঙ্গে নিয়ে বরিশাল শহরে পৌঁছে ত্রাণের তদারকি করেন। পরে সুভাষচন্দ্র বসুকে খুলনা হয়ে ভোলা ও বরিশালে নিয়ে আসেন। বরিশালে সুভাষচন্দ্রের বিশাল সভায় সভাপতিত্ব করেন যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। সুভাষের নির্দেশে ইরাণি বংশোদ্ভুত বিশিষ্ট আইনজীবী, নেত্রী ও কাউন্সিলার শাকিনার নেতৃত্বে কলকাতা কর্পোরেশনের ২০ হাজার ধাঁঙর-মেথর যে ঐতিহাসিক ধর্মঘটে অংশ নেন যোগেন্দ্রনাথ তাঁদের তপশিলি সংগঠন নিয়ে তাতে যোগ দেন এবং নিজে মেয়র সিদ্দিকি সাহেবের সাথে আলোচনা চালিয়ে কর্পোরেশনকে দাবীগুলি বেশিরভাগ মেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন।[৫]

লিগ-হক মন্ত্রীসভার পতনের পর প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন গড়ে তুলে ১৯৪১ সালে হক সাহেব আবার প্রধানমন্ত্রী হন ও মন্ত্রীসভা গঠন করেন। হক সাহেবকে সমর্থন করে কংগ্রেসের শরৎ বোস গোষ্ঠীর ২৮ জন,

কৃষক প্রজার ১৯ জন, হিন্দু মহাসভার ১২ জন, তপশিলি স্বতন্ত্র ১২ জন, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ২ জন, শ্রমিক ১, কংগ্রেস ও ন্যাশনালিস্ট ২৭ জন। ব্রিটিশ সরকার শরৎচন্দ্র বসুকে গ্রেফতার করে। হক সরকার মুসলমানদের জন্য বেশ কিছু সুবিধা ঘোষণা করলেন। ততদিনে পাকিস্তানের দাবি উঠে এসেছে। সেন্সাসে নিজেদের গোষ্ঠীর লোক বেশি দেখাতে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আক্রমণে নাজেহাল হয়ে ব্রিটিশ সিঙ্গাপুর, মালয়, বার্মা থেকে পিছু হটে বাংলাকে পূর্ব রণাঙ্গণ তৈরি করছে। বার্মা থেকে উদ্বাস্তুরা আসছিলেন। বেঙ্গল টেনান্সি বিল হারিয়ে গেল, গঠন হল ফ্রাউড কমিশন। পাটচাষীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলে যোগেন্দ্রনাথ বিধানসভায় ও পাটশ্রমিকদের সভায় পাটচাষীদের পক্ষে বললেন। ঢাকা শহরে এবং নারায়ণগঞ্জে দাঙ্গা শুরু হলে আবার যোগেন্দ্রনাথের ডাক এল। সঙ্গে গেলেন রসিকলাল বিশ্বাস। যোগ দিলেন ঢাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং তপশিলি ও কংগ্রেস নেতা মোহিনীমোহন দাস। এখানেও দেখা গেল বর্ণহিন্দুরা ইন্ধন জুগিয়েছেন এমনকি সাহারাও। অনেক কষ্টে মুসলমান এবং গোয়ালা, শাখারি, নমঃশূদ্রদের মধ্যে হিংসা সাময়িক বন্ধ করা গেল। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ এক পশ্চিমা হিন্দুত্ববাদী দুর্বৃত্তের আক্রমণে আহত হলেন। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে ইস্পাহানি প্রমুখ ব্যবসায়ীকে দিয়ে সমস্ত খাদ্য শস্য সরিয়ে নেওয়া হল ব্রিটিশ সেনার জন্য এবং জাপানিরা এলে যাতে না পায় তাই। এর সাথে নৌকা, সাঁকো সব ভেঙ্গে ফেলা হল। যোগেন্দ্রনাথ বিষয়টি বুঝতে কর্তাব্যক্তি এমনকি সামরিক অধ্যক্ষর সাথে দেখা করলেন। তারপর বরিশাল গিয়ে দেখলেন করুণ অবস্থা। কলকাতা শহর জুড়ে যুদ্ধভীতি, জাপানি বোমার আতঙ্ক, মন্ত্রী-আমলাদের দুর্নীতি, ব্যবসায়ীদের মজুতদারি, কালো বাজারি। আইনশৃঙ্খলার অবনতি। অন্যদিকে সুভাষের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর আগমন ও ভারতের মাটিতে প্রবেশ। ভারত জুড়ে ভারতছাড়ো আন্দোলন। বাংলায় ভয়াল দুর্ভিক্ষ। শ্যামা-হক সরকারের ব্যর্থতা। হক সরকার পড়ে গেল।[৬]

প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দ্বিতীয় ভোটের আগে ১৯৪২ সালে আম্বেদকরের সাথে যোগেন্দ্রনাথ 'অল ইন্ডিয়া সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন' তৈরি করেন এবং আম্বেদকরকে ফেডারেশনের নেতা হিসাবে মেনে নেন। এই ফেডারেশন তপশিলি আসনগুলিতে প্রার্থী দিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ কেন্দ্রিক মেরুকরণ হওয়া রাজনীতিতে একমাত্র যোগেন্দ্রনাথ জিতে বিধায়ক হলেন। বাকি প্রার্থীরা পরাজিত হল। এবার নাজিমুদ্দিনের কোয়ালিশন সরকার হল। এবার যোগেন্দ্রনাথকে মন্ত্রী করা হল। ১৯৪৩-র ২৪ এপ্রিল ঐ মন্ত্রীসভায় যোগেন্দ্রনাথ ছাড়াও তপশিলিদের মধ্যে পুলিনবিহারী মল্লিক ও প্রেমহরি বর্মন মন্ত্রী হলেন। কথিত আছে যোগেন্দ্রনাথ নাজিমুদ্দিনকে চাপ দিয়ে তপশিলি মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু, সেইসময় তাঁর মূল কাজ ছিল দেশ ও গ্রাম থেকে নিরন্ন মানুষের আসা স্রোতে খাদ্য ও ত্রাণ যোগানো। যশোর রোডে বারাসতের কাছে লঙ্গরখানা খোলা হল। কিন্তু তা যে বড্ড অপ্রতুল। বাংলার দুর্ভিক্ষে ২০-৩০ লক্ষ মানুষ মারা গেলেন, বেশীরভাগই গ্রামের গরীব কৃষক। ব্রিটিশ ইম্পাহানিদের এই তৈরি করা দুর্ভিক্ষে প্রাণ গেল তাঁর বরিশাল-খুলনা-যশোর-ফরিদপুরের অসংখ্য স্বজনের। এরপর যোগেন্দ্রনাথের সাথে হিন্দু মহাসভার টক্কর লেগে গেল। চারিদিকে হাহাকার ও সাম্প্রদায়িক পরিবেশে হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগের একাংশ দাঙ্গার ইন্ধন জ্বালিয়ে যাচ্ছিলেন। গোপালগঞ্জকে নিয়ে বড় পরিকল্পনা নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ সদলবলে সেখানে গেলে যোগেন দলবল নিয়ে সেখানে গিয়ে মিটিংতো দূরের কথা লঞ্চ থেকে তাদের নামতেই দিলেন না। এর ফলে বাংলায় যোগেন্দ্রনাথ হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেসের শত্রু তো ছিলেনই আর.এস.এস., হিন্দু মহাসভার প্রধান শত্রু হয়ে উঠলেন।[৭]

অন্যদিকে যোগেন্দ্রনাথ ১৯৪৩-৪৬এ নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভার সদস্য এবং বিধানসভায় ২১ জন তপশিলি স্বতন্ত্র বিধায়কদের নেতা হিসাবে একজন নিয়ামক নেতা হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে যোগেন মণ্ডল যেসব এলাকায় দলিত সম্প্রদায়ের ভোটার বেশি ছিল সেই সব এলাকায় মুসলিম লীগ প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করেন এবং তাঁদের জিতিয়ে আনতে সক্ষম হন। তাঁর বক্তব্য ছিল 'ছোটলোকদের এক হওয়া প্রয়োজন।' তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্শান্বিত হয়ে ১৫ হ্যারিসন রোডের তপশিলি ফেডরেশনের এক সভায় পরিকল্পিতভাবে পি.আর. ঠাকুর, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, প্রমুখের নেতৃত্বে যোগেন্দ্রনাথকে আক্রমণ করা হয়। অন্যদিকে অগ্নি মণ্ডলের নেতৃত্বে হিন্দুমহাসভা পন্থী তপশিলি নেতৃত্ব তাঁকে হিন্দু বিরোধী হিসাবে আক্রমণ করেন। আম্বেদকরের সঙ্গ নেওয়ার জন্যও তাঁকে সমালোচনা করা হয়। যোগেন্দ্রনাথ তাঁর তপশিলি ও শূদ্রকেন্দ্রিক রাজনীতির জবাব দেন, গত ১০ বছরের কাজে সালতামামি ব্যাখ্যা করে উচ্চবর্ণের প্রবল বাধার বিষয়গুলি তুলে ধরেন। এরপর বাংলা জুড়ে সাম্প্রদায়িক আবহে তপশিলি নেতৃত্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি বড় অংশ 'মতুয়া' গুরু পি. আর. ঠাকুরের নেতৃত্বে কংগ্রেসের দিকে ঝোঁকেন। আরেকটি অংশ হিন্দু মহাসভার প্রতি। যোগেন্দ্রনাথ তাঁর শূদ্রকেন্দ্রিক উচ্চবর্ণীয় কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা বিরোধী রাজনীতিতে অটল থেকে স্বাভাবিক মিত্র মুসলিম লিগ—কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় এবং তপশিলি ফেডারেশনের কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৬ সালে বাংলার সোরাওয়ারদির মুসলিম লিগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাতেও যোগেন্দ্রনাথ বিচার, আইন ও পূর্তবিভাগের মন্ত্রী হলেন।[৮]

গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে ১৯৪৬-র আগস্ট কলকাতায়, তারপর নোয়াখালিতে, তারপর বিহার, পাঞ্জাব, দিল্লি, অন্যত্র হল একের পর এক ভয়ানক দাঙ্গা, খুন, রক্তপাত, লুঠ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ। ফলশ্রুতিতে দুই সম্প্রদায়ের আক্রান্ত মানুষের আতঙ্ক, ভিটেমাটি ত্যাগ ও উদ্বাস্তুর স্রোতে সামিল হওয়া। যোগেন্দ্রনাথ তার স্বজাতি অঞ্চলে এই দাঙ্গা-রক্তপাত অনেকটাই আটকাতে পারলেন এবং স্বজাতিদের আশ্বস্ত করলেন দেশে থেকে যাওয়ার জন্য। সেই পর্যায়ে বাঙালি মুসলমানরা নমঃশূদ্রদের গায়ে হাত দেয়নি। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে ভাইসরয় ওয়াভল ১৯৪৫এর সেপ্টেম্বর একটি অন্তবর্তী সরকার গড়লেন দিল্লিতে। নেহরু প্রধানমন্ত্রী হলেন। কংগ্রেস ১২ জন মন্ত্রীর তালিকা দিল। জিন্না প্রথমে রাজি না হলেও ৫ অক্টোবর পাঁচজন মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করে যোগ দিলেন। লিগ-কোয়ালিশনের এই পাঁচজন মন্ত্রী ছিলেন— লিয়াকৎ আলি, চুন্দ্রিগড়, আবদুর নিস্তার, গাজনফর আলি ও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। সাম্প্রদায়িক আবহে এবং অনেকখানি ঈর্ষায় কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে অন্যদলের নেতাদের দ্বারা যোগেন্দ্রনাথের বিপক্ষে কুৎসা শুরু হল। কেন্দ্রের অন্তবর্তী সরকারের আইনমন্ত্রী হিসাবে যোগ দিতে যোগেন্দ্রনাথ দিল্লি গেলেন।[৯]

দেশভাগের প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালে সিলেটে গণভোট হয়। জিন্নাহর অনুরোধে যোগেন মণ্ডল সিলেটে গিয়ে দলিত সম্প্রদায়ের মাঝে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য জোর প্রচারণা চালান এবং শেষ পর্যন্ত সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার চেষ্টার একেবারে শেষ দিকে সারা ভারতে লিগ নেতৃত্ব বাদ দিয়ে একমাত্র যোগেন্দ্রনাথ পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। এরপর মাউন্টব্যাটেন এসে দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর ত্বরান্বিত করলেন। ভারত ও পাকিস্তান এই নামে দেশ বিভক্ত হল। যোগেন মণ্ডল ও তাঁর দলিত অনুসারীরা দেশ ত্যাগ না করে পূর্ব পাকিস্তানেই রয়ে যান। তিনি ৬৯ সদস্যবিশিষ্ট পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। জিন্নাহ যোগেন মণ্ডলকে পাকিস্তানের গণপরিষদের অস্থায়ী স্পিকার নিযুক্ত করেন এমনকি, ১৯৪৯ সালের ১৯ জুন খুব ধুমধাম করে পাকিস্তানে সরকারি নির্দেশে পালিত

হয়েছিল 'মন্ডল দিবস'। যোগেনবাবুকে সম্বর্ধনা, তাঁর গুণগানের নানা আয়োজন করেছিলেন পাকিস্তান সরকার। সিন্ধু প্রদেশের দলিত সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চল সাজানো হয়েছিল আলো দিয়ে, ফুল দিয়ে আর রাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে। ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করে যোগেন মণ্ডলের কাছে গভর্নর জেনারেলের শপথ গ্রহণ করেন।[১০] জিন্নাহ যোগেন মণ্ডলকে পাকিস্তানের প্রথম আইন ও শ্রমমন্ত্রী নিয়োগ করেন।পরে তিনি পাকিস্তানের শ্রম, কমনওয়েলথ ও কাশ্মীর বিষয়ক মন্ত্রী হন। এতসব আয়োজনের মধ্যে দিয়ে লীগ সরকার কি বার্তা দিতে চেয়েছিল? প্রথমত, যোগেন্দ্রনাথের এই গুরুত্বকে বিশ্ব দরবারে পাকিস্তানের উদার ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস হিসাবে দেখা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দুনিয়ায় ধর্মের ভিত্তিতে তৈরী পাকিস্তানের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর প্রয়োজনে হয়তো যোগেন্দ্রনাথকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন সে দেশের সরকার। দ্বিতীয়ত, যোগেনবাবুকে দলে টেনে পাকিস্তান সরকার দেশের দলিত নাগরিকদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন এমনটাও আমরা ভাবতে পারি। পূর্ব পাকিস্তানে দেশভাগের পরপর দলিতদের মধ্যে নানা কারণে দেশত্যাগের প্রবণতা ছিল লক্ষ্যনীয়ভাবে কম। পশ্চিম পাকিস্তানেও যে অল্পসংখ্যক সংখ্যালঘুরা রয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের সিংহভাগই ছিলেন দলিত। তাঁদের মনে আস্থা যোগাতে ও তাঁদের মন থেকে অভিবাসনের চিন্তা দূর করতে তাঁদের নেতাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন লীগ কর্তৃপক্ষ। দলিতরা দেশত্যাগ করলে পাকিস্তানের কী ক্ষতি? সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন।দলিতদের প্রয়োজন ছিল পাকিস্তানের ভাবমূর্তির জন্য এবং রাষ্ট্রনির্মাণে প্রয়োজনীয় সস্তা শ্রমের জন্য। এছাড়া পাকিস্তান থেকে দলে দলে সকল হিন্দু- তা তাঁর জাতি-বর্ণ যাই হোক না কেন- ভারতে চলে গেলে, সে দেশ থেকে বিপরীত দিকে বিপুল সংখ্যক মুসলমান অভিবাসন হতে পারে সেই আশঙ্কাও ছিল। তৃতীয়ত, প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যেই বোধহয় ছিল ভারতের প্রতি বার্তাও। পাকিস্তানের পিছনে দলিত সমর্থন রয়েছে এবং যোগেনবাবু ও লীগের সখ্য আসলে দলিত-মুসলমান সখ্যের প্রতিফলন - এমন বার্তাই বোধহয় জিন্নাহ ও তাঁর পরে লিয়াকত আলি পরোক্ষভাবে দিতে চেয়েছিলেন। ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ ও কংগ্রেস আসলে বর্ণহিন্দুর দেশ ও দল, তাঁদের কাছে মুসলমান ও দলিত দুইই প্রান্তিক, অচ্ছ্যুত। মোদ্দা কথা, যোগেনবাবু তাঁদের লোক একথা বলার পিছনে মুসলিম লীগের নানা সম্ভাব্য হিসাব নিকাশ ছিল।

জিন্নাহর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় বসেন লিয়াকত আলি খান। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি পাকিস্তানকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ও ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করলে সব হিসাব নিকাশ উল্টেপাল্টে যায়। জিন্না পরবর্তী পাকিস্তানে শাসনতন্ত্রের ক্রমবর্দ্ধমান সামরিকিকরণ, ইসলামিকরণ ও পাঞ্জাবীকরণে যোগেন মণ্ডল কোণঠাসা হয়ে পড়েন। পশ্চিম পাকিস্তানি প্রভাব পূর্ব পাকিস্তানেও পড়ে। সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। ব্যাপক হিন্দু বিরোধী দাঙ্গায় বহু নমঃশূদ্রও হতাহত হয়। উদ্বাস্তুর স্রোত ভারতের দিকে ছোটে। মন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৫০ সালের ৮ অক্টোবর কলকাতায় বসেই পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের উদ্দেশ্যে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। তাই তিনি ওই চিঠিতেই পাকিস্তান মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে একপ্রকার পালিয়ে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে।একইসঙ্গে কয়েক লক্ষ নমশূদ্র, মতুয়া, তপশিলি জাতির মানুষও চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। তিনি তার পদত্যাগের চিঠিতে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি সামাজিক অন্যায় ও পক্ষপাতমূলক আচরণ সম্পর্কিত ঘটনা উল্লেখ করেছেন।[১১]

এরপর তিনি ১৯৫২-র নির্বাচনে বেনিয়াপুকুর-বালিগঞ্জ কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রার্থী হয়ে পরাজিত হন। প্রথমে SBBS ও UCCR-র সাথে উদ্বাস্তুদের নিয়ে কাজ করছিলেন। দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পাঠানোর

বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্বে দেন। পরে UCCR ব্রাত্য করে দিলে ১৯৫৭এ তৈরি করেন 'ইষ্ট ইন্ডিয়া রিফিউজি কাউন্সিল (EIRC)'। কিন্তু ধারাবাহিক চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হন কারণ ততদিনে তপশিলি উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে নিয়েছে সিপিআই, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব দখল করে নিয়েছেন মতুয়া গুরু ও কংগ্রেস নেতা পি. আর. ঠাকুর। তা সত্ত্বেও উচ্চবর্ণ ও কংগ্রেস পরিবেষ্টিত আবহে আমৃত্য কুৎসা, নিন্দা ও ব্যর্থতার ঐকতানের মধ্যেও তিনি যথাসাধ্য তপশিলি, নমঃশূদ্র এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য কাজ করে গেছেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা উল্লেখ না করলে নয় ১৯৬৫ সালে ভারত সরকার তপশিলি জাতি ও উপজাতির সংক্রান্ত বিষয়ে এক সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে,তার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন বি.এন.লককুর। এই লকুর কমিটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে চারটি সম্প্রদায়কে তপশিলি জাতির তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করে এই চারটি সম্প্রদায় হল নমঃশুদ্র, রাজবংশী, সাহা (শুড়ি) ধোবা।এই খবর প্রচারিত হওয়ার ফলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সকলেই যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের শরনাপন্ন হন নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। যোগেন্দ্রনাথ তখন দেশ ভাগ এবং পরবর্তী ঘটনা ক্রমে বিধ্বস্ত। তপশিলি জাতির চারটি সম্প্রদায়ের উপর এই কুঠারাঘাত তিনি মেনে নিতে পারেননি। তিনি আবার সিংহ গর্জনে প্রস্তুত হলেন। প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে অর্জিত অধিকার ছিনিয়ে আনলেন। ১৯৬৮ সালের ৫ অক্টোবর তিনি তার গৃহে পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন।

তথ্যসূত্র:

১। Heyworth-Dunne, James 'Pakistan: the birth of a new Muslim state' University of Michigan: Renaissance Bookshop, Cairo, (১৯৫২), পৃ. ৭৯।

২। Tai Yong Tan, Gyanes Kugaisya (২০০০), 'The Aftermath of partition in South Asia' Routledge Publishing Co., ২০০০, পৃ. ৪৫-৪৮।

৩। Ahmad, Salahuddin, 'Bangladesh: Past and Present' APH Publishing Co., New Delhi, ২০০৪, পৃ. ৭৭-৮৪।

৪। অলক বিশ্বাস, 'যোগেন মন্ডল দেশ ভাগের এক ট্র্যাজিক নায়ক,' এন বি এ প্রাইভেট লিমিতেদ, কলকাতা,২০২৫ পৃ. ৪৪-৪৮।

৫। তদেব, পৃ. ৫০-৫২।

৬। ব্রিজলাল, 'রাজনীতির চক্রব্যূহে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল' শিভাঙ্ক প্রকাশন,২০২৪, পৃ. ৯৪-১০৮।

৭। আলতাফ পারভেজ 'যোগেন মন্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ' প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা ২০১৯, পৃ. ১৩০-১৩৫।

৮। সেন দ্বৈপায়ন, 'Decline of the Caste Question' Cambridge University Press, ২০১৮, পৃ. ১৭২-১৭৬।

৯। Ahmad, Salahuddin, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৪-১১৮।

১০। বসু অঞ্জলি ও সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র (সম্পাদকগণ), 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান' (খণ্ড -১), (পঞ্চম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ সংস্করণ)। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৬১১-৬১২।

১১। অলক বিশ্বাস, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৪-৫৮।